দ্বাদশ অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়ন

[বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং বিশ্বায়নের পটভূমিকায় মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব নতুন মাত্রা লাভ করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নও তাই বর্তমান সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার আর্থ সামাজিক খাতে শতকরা ২০ ভাগের অধিক হারে অর্থ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন-শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজ কল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করছে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৬৪.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় দেশের স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য সেবায় অর্জিত সাফল্য অব্যাহত রেখে এ খাতের আরও উন্নয়নের জন্য ২০১১-১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর (HPNSDP) কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক,সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঘোষণা করা হয়েছে নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে প্রণয়ন করা হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০। শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে ২০১১ সালে গৃহীত হয়েছে জাতীয় শিশু নীতিমালা ২০১১। এছাড়া, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, প্রণীত হয়েছে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, Human Development Report, 2014 অনুযায়ী ২০১৩ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২ তম যা ২০১২ সালে ছিল ১৪৩ তম।]

বিশ্বায়নের এ যুগে মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকসমূহ জাতীয় উন্নয়নের একটি অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল অঙ্গীকার হচ্ছে মানব কল্যাণ। সরকার এ অঙ্গীকার অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, Human Development Report, 2014 অনুযায়ী ২০১৩ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২ তম যা ২০১২ সালে ছিল ১৪৩ তম। বর্তমানে মানব উন্নয়ন সূচকসমূহে বাংলাদেশের অবস্থান মধ্যম মানের পর্যায়ে রয়েছে। মানব উন্নয়ন সূচকসমূহের ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা (০.৭৫০), ভারত (০.৫৮৬) এবং ভূটান (০.৫৮৪) বাংলাদেশ (০.৫৫৮) অপেক্ষা এগিয়ে আছে। অপরদিকে, নেপাল (০.৫৪০) এবং পাকিস্তান (০.৫৩৭) এর অবস্থান বাংলাদেশ অপেক্ষা নিচে।

বিগত ছয় বছর জ্বালানি ক্ষেত্রে বিপর্যয় এবং পরিবহণ খাতে দুর্বল অবস্থার মোকাবেলা করতে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে। এখন থেকে এই অগ্রাধিকার পাবে মানব উন্নয়ন। যদিও বাজেট বরাদ্দে ঐ দুটি খাত আরো দু-তিনবছর এগিয়ে থাকবে। মানব উন্নয়নে অগ্রগতি সময় সাপেক্ষ, তবে সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা হলো যে, নিরবিচ্ছিন্ন অগ্রাধিকার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।
গত তিন দশকের ও সাম্প্রতিক সময়ের মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের চিত্র সারণি ১২.১ -এ দেয়া হল।

সারণি ১২.১ঃ মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ

বৎসর	১৯৮০	১৯৯০	২০০০	২০০৫	২০০৮	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
সূচকের মান	০.৩৩৬	০.৩৮২	০.৪৫৩	০.৪৯৪	০.৫১৫	০.৫৩৯	০.৫৪৯	০.৫৫৪	০.৫৫৮

উৎসঃ Human Development Report, 2014. UNDP

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ

মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সামাজিক খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ। কারণ, সামাজিক খাত উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে অধিকতর মূল্য সংযোজনে যথেষ্ট অবদান রাখে। এ কারণেই বাংলাদেশ সরকার বাজেট বরাদ্দের ২০ শতাংশের অধিকহারে আর্থ সামাজিক খাতে ব্যয় করে আসছে। সুখী, সমৃদ্ধ ও সংবেদনশীল বাংলাদেশ গড়তে মানবসম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। তাই জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রেখে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সূচকের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন এবং প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও AIDS বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নও মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম। অপরদিকে দেশের জনসংখ্যার সিংহভাগই নারী, শিশু ও যুবক। তাদের সমস্যা এবং অসুবিধাসমূহকে সরাসরিভাবে চিহ্নিত করে উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা ও সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে। এ জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের (শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান) ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লেখচিত্র ১২.১: মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের গতিধারা

*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক।

২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে লেখচিত্র ১২.১ ও সারণি ১২.২ -এ দেখানো হলো। লক্ষ্যণীয় যে, এ খাতে গত এক দশকে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে।

সারণি ১২.২ঃ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) বিবরণ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫*
শিক্ষা এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৯৩৭৩	১১০৫৭	১১৬৫৪	১২৫৩৫	১৬১৭১	১৮৫৭৫	২০৩১৬	২১৫৬১	২৮২৭২	৩২৭৬৯
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৪১১২	৪৯৫৭	৫২৬১	৬১৯৬	৬৮৩৩	৭৬১৭	৮৮৬৯	৯১৩০	৯৯৫৫	১১১৪৬
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	৪১৪	৩৩৫	২৮৭	৩২০	৫৩০	৯১১	৯২৪	৯৭৬	১০৬১	১০৫৩
শ্রম ও কর্মসংস্থান	১০৬	৯৬	১১৯	১২০	৬৯	৬৭	৮২	১৩৪	১৯২	১৪৭
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	১৩৫৩	১৪৬৮	২০২৮	২৩৯৬	২৮১২	৩৪৯৯	৩৯৬৭	৪০৯১	৪৭৩০	৬২২৬
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৩৬৭	৪১৬	৪৬৯	৫৫৩	৪৬৫	৫৪৯	৫৬০	৫৮৩	৬৩৩	৭৩৫
মোট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)	**১৫৭২৫**	**১৮৩২৯**	**১৯৮১৮**	**২২১২০**	**২৬৮৮০**	**৩১২১৮**	**৩৪৭১৮**	**৩৬৪৭৫**	**৪৪৮৪৩**	**৫২০৭৬**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। *তথ্যসমূহ মূল বাজেট ভিত্তিক।

শিক্ষা ও প্রযুক্তি

যথাযথ শিক্ষা পদ্ধতি এবং সঠিক শিক্ষা কাঠামো দেশের উন্নয়নের কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। এ লক্ষ্যে শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ প্রণীত হয়েছে। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা।

প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা

বর্তমান সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে আসছে। চলতি অর্থবছরে (২০১৪-১৫) প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১৩,৫০৪.৮৬ কোটি টাকা। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে যে সকল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তন্মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, উপবৃত্তি প্রকল্প, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩), রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প, দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কার্যক্রম, মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। এ সংখ্যা বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১০৮,৫৩৭টি (ব্র্যাক সেন্টার, শিশু কল্যাণ ও মাদ্রাসাসহ)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫ঃ৪৫। বর্তমানে তা প্রায় ৪৯.৩ ঃ ৫০.৭-এ উন্নীত হয়েছে। ২০০৫ হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার সারণি ১২.৩ -এ দেখানো হল।

সারণি ১২.৩ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

(লক্ষে)

বছর	মোট	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)	নীট ভর্তির হার (%)
২০০৫	১৬২.২৫	৮০.৯১ (৪৯.৮৭)	৮১.৩৪ (৫০.১৩)	৮৭.২
২০০৬	১৬৩.৮৬	৮১.২৯ (৪৯.৬২)	৮২.৫৬ (৫০.৩৮)	৯০.৯
২০০৭	১৬৩.১৩	৮০.৩৫ (৪৯.২৬)	৮২.৭৮ (৫০.৭৪)	৯১.১
২০০৮	১৬৭.৪৯	৮৩.২৫ (৪৯.৭০)	৮৪.২৪ (৫০.৩০)	৯০.৮
২০০৯	১৬৫.৩৯	৮২.৪১ (৪৯.৮৩)	৮২.৯৮ (৫০.১৭)	৯৩.৯
২০১০	১৬৯.৫৮	৮৩.৯৫ (৪৯.৫০)	৮৫.৬৩ (৫০.৫০)	৯৪.৮
২০১১	১৮৪.৩২	৯১.৩৯ (৪৯.৬০)	৯২.৯৩ (৫০.৪০)	৯৪.৯
২০১২	১৯০.০৩	৯৪.৬৩ (৪৯.৮০)	৯৫.৪০ (৫০.২০)	৯৬.৭
২০১৩	১৯৫.৮৫	৯৭.৮১ (৪৯.৯৪)	৯৮.০৪ (৫০.০৬)	৯৭.৩
২০১৪	১৯৫.৫৩	৯৬.৩৯ (৪৯.৩০)	৯৯.১৪ (৫০.৭০)	৯৭.৭

উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষাকাল সমাপ্ত না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সরকার কর্তৃক বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণের ফলে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে চলেছে। ২০০৬-২০১৪ পর্যন্ত বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ১২.৪ -এ দেখানো হল।

সারণি ১২.৪ঃ বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার

বৎসর	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
মোট ঝরে পড়ার হার (%)	৫০.৫	৫০.৫	৪৯.৩	৪৫.১	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯

উৎসঃ Annual Primary School Census, 2014, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সারণি ১২.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০০৬ সালে মোট ঝরে পড়ার হার ছিল ৫০.৫ শতাংশ যা হ্রাস পেয়ে ২০১৪ সালে ২০.৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

গৃহীত/গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ এবং সংযোগ ঘন্টা (contact hour) বৃদ্ধির বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে ।
- বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত ৬০:৪০ অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত হলো ৬৪.৯:৩৫.১ ।

- প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) ও উপজেলা এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আরো গতিশীল, কার্যকর ও কর্মমুখী করার প্রয়াসে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি অনুমোদন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- প্রতিবছর সারাদেশে পঞ্চম শ্রেণীর মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০০৯ সাল হতে সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এবং ২০১০ সাল হতে এবতেদায়ী মাদ্রাসায় সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- বিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে "ইংলিশ ইন এ্যকশান" প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- উপবৃত্তি ৪০ শতাংশ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করাসহ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৮ লক্ষ থেকে ৭৮.৭০ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। স্কুল ফিডিং কার্যক্রম, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন, চর, হাওর-বাওর এলাকায় শিখনকেন্দ্র স্থাপন এবং দেশের সকল উপজেলাকে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ধরে রাখার লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৯৬টি উপজেলার ৩১ লক্ষ শিশুদের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্কুল খোলার দিন দৈনিক ৭৫ গ্রাম ফর্টিফাইড বিস্কুট বিতরণের কার্যক্রম চলমান আছে। এই কার্যক্রমকে বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে।
- দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীদের মধ্যে সাক্ষরতার আলো পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মৌলিক সাক্ষরতা (৬৪ জেলা) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং ঝরে পড়া ৭-১৪ বছর বয়সী প্রায় ৪.৫ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পিইডিপি-৩ এর আওতায় 'সেকেন্ড চান্স এডুকেশন' প্রোগ্রাম বাস্তবায়নাধীন আছে।
- দেশের ২৬,১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি বিধিমালার আলোকে সরকারিকরণ করা হয়েছে।
- জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ অনুসরণে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে এবং এ পর্যন্ত ৬৬৬ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি খোলা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

অবকাঠামোগত সুবিধাদি

অবকাঠামোগত সুবিধাদি বৃদ্ধি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের পরিবেশ উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ১১৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে, ৮৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুনঃনির্মাণের কাজ চলছে। পিইডিপি-৩ এর আওতায় ১৭৭টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ, ২,০২১টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ৬৯টি বিদ্যালয় মেরামত সম্পন্ন হয়েছে এবং ১২৩টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ, ৩,৯৭৯টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ৬৩১টি বিদ্যালয় মেরামত কাজ চলমান আছে। এ ছাড়াও ১৩,১৫২টি গভীর/তারা নলকূপ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে, ১,০৪০টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। পিটিআইবিহীন নির্বাচিত ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১,৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ চলছে। চলতি অর্থবছরে ২০৫ টি বিদ্যালয় নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে ও ৩৪০ টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

সমাপনী পরীক্ষা ও বৃত্তি প্রদান

বর্তমানে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৪ সালের পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৬.৮৪ লক্ষ এবং পাশের হার ৯৭.৯২ শতাংশ। এবতেদায়ী মাদ্রাসা হতে সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২.৬৬ লক্ষ এবং পাশের হার ৯৫.৯৮ শতাংশ। বিগত সময়ের মত পৃথকভাবে বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ না করে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায় ২২ হাজার পরীক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৩২ হাজার জনকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের শ্রমজীবী শিশুদের জন্য শহর, নগরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শ্রমজীবী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্য শিশু কল্যাণ ট্রাষ্টের মাধ্যমে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি

প্রাথমিক শিক্ষার পাঁচ বছর মেয়াদি চক্র শেষ না করেই বহু শিশু বিদ্যালয় ত্যাগ করে। কারণ, দরিদ্র পরিবারের পিতামাতাগণ তাঁদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে উপার্জনের জন্য বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করেন অথবা পিতামাতার পেশায় সহযোগী হিসেবে নিয়োজিত রাখেন। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ৫,৬৮৭.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে ‘প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি ২য় পর্যায় (২০০৮-১৫)’ -শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উপবৃত্তি প্রাপ্তির আওতা ৪০ শতাংশ হতে চাহিদাভিত্তিক বৃদ্ধি করায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৭৮.৭০ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে প্রকল্পের নীতিমালার আওতায় দরিদ্র পরিবারের এক সন্তান বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য মাসিক ১০০ টাকা এবং একাধিক সন্তানের জন্য মাসিক ১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সরকার প্রতিবছর বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করছে। বছরের শুরুতেই যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে সে লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। বিগত বছরে ৫০ শতাংশ নতুন এবং ৫০ শতাংশ পুরাতন বই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১০ সাল হতে সকল শ্রেণীতে শতভাগ নতুন বই প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ১১ কোটি ৬০ লক্ষ এবং ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ১১ কোটি ৪৩ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। বইয়ের প্রতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য চার রংয়ের নতুন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। আগামীতে শতভাগ নতুন বই বিতরণ অব্যাহত থাকবে।

শিক্ষক নিয়োগ

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ৬০ শতাংশ শিক্ষিকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার আনুপাতিক হার বর্তমানে প্রায় ৬৪.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ও সৃষ্টপদে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য প্রথম পর্যায়ে ১৫,০০০ জন এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ৭,৫০০ জন সহকারি শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে আরো ১৫,০০০ সহকারি শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১,৫০০টি নতুন বিদ্যালয় নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে। এ সকল বিদ্যালয়ের জন্য মোট ৩,৩৩৫টি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

স্কুল বহির্ভূত ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য কার্যক্রম

স্কুল বহির্ভূত, ঝরে পড়া এবং শহরের কর্মজীবী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে দেশের নির্বাচিত ১৪৮টি উপজেলায় ১,১৪০.২৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (২য় পর্যায়) প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ২১,৩৬১ টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭.১৫ লক্ষ শিশু ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে। শিশুদেরকে ১ম থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত মাথাপিছু ৮০ টাকা হারে এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত মাথাপিছু ১০০ টাকা হারে শিক্ষা সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা ইউনিফর্ম এর জন্য বছরে ৪০০ টাকা, ১ম থেকে ৩য় শ্রেণি এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষা উপকরণ বাবদ প্রতিবছর যথাক্রমে ২০০ টাকা এবং ৩০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে। ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১০০০ টাকা এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তিকৃত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হতে ভর্তি সনদ প্রদর্শন সাপেক্ষে ২০০০ টাকা সহায়তা পাচ্ছে। ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী প্রায় ৩ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভুত এবং ঝরে পড়া শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কার্যক্রমের আওতায় দেশের ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর কিশোর ও বয়স্কদের মৌলিক শিক্ষা ও জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করার পরিকল্পনা রয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মানবতার বিকাশ ও জনমুখী উন্নয়ন এবং বিজ্ঞানমনস্ক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে উপবৃত্তি প্রদান ও এককালীন বরাদ্দ প্রদান, বিনামূল্যে বই বিতরণ, স্নাতক পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ, শিক্ষার সকল স্তরে সুযোগ সৃষ্টির জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষার মানোন্নয়নে নতুন কারিক্যুলাম প্রণয়ন, দেশে-বিদেশে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, কৃতিভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন (performance based continuous evaluation), শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশন ও অন-লাইন কার্যক্রম গ্রহণ, উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি, উচ্চ শিক্ষায় সুযোগদানের জন্য নতুন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে ৩২,৭৩১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ৪,৩৪,২৯৯ জন শিক্ষক এবং ১,৩৯,৯০,৬৪৯ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষাকে মানসম্মত, সর্বব্যাপী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে প্রতি বছর ১ জানুয়ারি সমগ্র বাংলাদেশে একযোগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৮৯৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৩ হাজার ৩৯৩ টি পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

এছাড়া, উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত অনলাইন পদ্ধতিতে তথ্য বিনিময় চালু করা হয়েছে এবং এমপিও পদ্ধতির জটিলতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের অনলাইনে এমপিও কার্যক্রম চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের অধীন মোট ৬৪টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে খুঁজে বের করার জন্য সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য Secondary Education Sector Investment Program (SESIP) এর আওতায় ৩৬৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মাঠপর্যায়ে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। Secondary Education Quality & Access Enhancement Project (SEQAEP) প্রকল্পের কার্যক্রম ২১৫টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে ১,৪০৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ১৩,০০৮৯ জন শিক্ষার্থীকে ইনসেনটিভ এওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সুপেয় পানীয় জল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৫০ টি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে । টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টিকিউআই-২)ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট (TQI-II) এর মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কারিগরি শিক্ষা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এ লক্ষ্যে মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অস্বচ্ছল পরিবারের তরুণ-তরুণীদেরকে আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী ও দেশে-বিদেশে চাকুরী বাজার চাহিদার ভিত্তিতে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড ও টেকনোলজী কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোট ৭,০০২ টি যার মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ২৯৩টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৬,৭০৯ টি। এছাড়া, কারিগরি সাব সেক্টরে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে এবং বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের ৭টি বিভাগীয় সদরে ৭টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ নির্মাণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল (টিএস) স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। তাছাড়া বিদ্যমান ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে ১টি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা

সরকার দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের পুরাতন প্রায় সবগুলো জেলাতেই সরকার কর্তৃক একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭টিতে উন্নীত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য সরকার নিরলসভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে স্থাপিত নতুন ও পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একাডেমিক ভবন, শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক ভবনসহ বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির মাধ্যমে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, সরকার খুলনায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামে একটি মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশালে একটি মেরিন বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া, দেশে মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ইসলামিক আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে সরকার Cross Border Higher Education (CBHE) -2014 আইন পাসের মাধ্যমে বিশ্বের সেরা মানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাংলাদেশে স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন Higher Education Quality Enhancement (HEQEP) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সৃজনশীলতায় উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার পরিবেশ সৃজনের জন্য Academic Innovation Fund প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, দেশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে Bangladesh Research and Education Network (BdREN) স্থাপন এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ছাত্র ও শিক্ষকদের সাথে আন্তর্জাতিক একাডেমিক কমিউনিটি এবং তথ্য ভান্ডারের সাথে সংযুক্ত করার ফলপ্রসূ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, গাজীপুর জেলায় একটি ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যুগের চাহিদার নিরিখে আধুনিক ল্যাবরেটরি, গবেষণা কেন্দ্র ও

ইন্সটিটিউটসমূহকে সুসংহত ও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নিয়ন্ত্রণের জন্য Accreditation Council গঠণের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং মানোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' এ রূপান্তরের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ এ মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্দেশ্য ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতি সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার কামিল ও ফাজিল স্তরে একাডেমিক সুপারভিশন, পরীক্ষা গ্রহণ, সার্টিফিকেট প্রদান তথা সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৩ পাশ হয়েছে । উক্ত আইনের অধীনে ইতোমধ্যে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমান সরকার কর্তৃক পৃথক মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১ম থেকে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত কুরআন মজিদ, আকাইদ ও ফিকহ, আরবি ও হাদিস শরীফ বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান সাধারণ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি বিষয়সমূহ ব্যতীত সাধারণ আবশ্যিক (Core) এবং ঐচ্ছিক বিষয়ে এনসিটিবি কর্তৃক উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসৃত হচ্ছে। সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবি'র মাধ্যমে মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থাকরণ এবং ২০১৪ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি ও ইসলামী বিষয়সমূহ ব্যতিত অন্যান্য বিষয়ে অভিন্ন সিলেবাসে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে কৃষি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা/ক্যারিয়ার শিক্ষাসহ প্রতিযোগিতামূলক, আধুনিক ও জীবনমুখী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ১ম-৯ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৫০ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪ কোটি ৮৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬০২ টি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ও ফরমপূরণের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদিত হচ্ছে।

শিক্ষায় আইসিটি কার্যক্রম

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়টি শিক্ষার সকল স্তরে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে Electronic Students Information Form (e-SIF) এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল, আলিম ও সমমানের পরীক্ষা, শিক্ষক নিয়োগ ও নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ, এসএমএস এর মাধ্যমে এবং ই-মেইলের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের প্রেরণ করা হচ্ছে। ব্যানবেইস কর্তৃক স্থাপিত online data query এর মাধ্যমে Criteria ভিত্তিক শিক্ষা উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে দেশের প্রায় ১৩,৭০০টি মাধ্যমিক স্কুল, ৫,২০০টি মাদ্রাসা ও ১,৬০০টি কলেজে একটি করে ল্যাপটপ ও একটি করে মাল্টিমিডিয়া প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির উপর ১৯,২২৬ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগোপযোগী আইসিটি ব্যবহারের লক্ষ্যে ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়বিহীন ৩১০ টি উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫০টি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এসইএসডিপি প্রকল্পের আওতায় ৩৩টি মডেল মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাবসহ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে চালুকৃত ৮টি (সরকারি) বিদ্যালয় এবং ৩টি সরকারি কলেজে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও চালুকৃত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ অর্থবছরে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে ১টি করে স্মার্ট বোর্ড স্থাপন করা হবে।শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত ৭০টি সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন

প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে আরো গ্রহণযোগ্য এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ২টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটউট ও ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে ৩২০টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন করা হয়েছে। ইস্টাবলিশমেন্ট অব ফরেন ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টারস-২ (এফএলটিসি-২) প্রকল্পের অধীনে বৈদেশিক কর্ম-সংস্থানের মাধ্যমে রেমিটেন্স আহরণে সরকারকে সহায়তা করার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের জন্য বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় (ইংরেজি, আরবি, কোরিয়ান, জাপানি, ফ্রেঞ্চ) দক্ষতা সম্পন্ন জনবল তৈরি করার লক্ষ্যে ওয়েবভিত্তিক ভাষা ১০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট সরকারি কলেজ এবং সরকারি আলিয়া মাদ্রাসায় ১২টি Digital Language Laboratory চালু করা হয়েছে।

নারী শিক্ষা উন্নয়ন

মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি চালুর ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থসামাজিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, মেধাবী ছাত্রীদেরকে সাধারণ মেধাবৃত্তি এবং বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নারীদেরকে কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহিত করা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত বিদ্যমান আসন সংখ্যা ১০ শতাংশ কোটা হতে ২০ শতাংশ কোটায় উন্নীতকরণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১২ জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। সরকার এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডে ১০০০ কোটি টাকা সীড মানি প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জন সম্ভব হবে।

শিক্ষার মানোন্নয়নে সংস্কারমূলক কর্মসূচি

শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে একাধিক প্রকল্পের আওতায় দেশে-বিদেশে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, কৃতিভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Performance Based Continuous Evaluation), নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনসহ নানাবিধ উন্নয়ন ও সংস্কারধর্মী কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম ও অসঙ্গতি দূর করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে 'জাতীয় শিক্ষা আইন, ২০১৩'এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ অনুসারে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদানের বিষয় এবং কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য 'বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয়ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে এবং তা বিশ্বমান পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে 'এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ, ২০১২' এর একটি প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি দেশের সকল নাগরিকের একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সরকারের গৃহীত স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সমূহের কারণে স্বাস্থ্য সেবার বিস্তার ও গুনগত মান উন্নত হয়েছে এবং সংক্রামক ব্যাধিসমূহ নিয়ন্ত্রনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কারণে জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে

এবং প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল-ও বেড়েছে। উল্লিখিত সাফল্য সত্ত্বেও অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে এবং পরিবেশ অনুকূল ও টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে International Conference on Population and Development (ICPD), Proverty Reduction Strategy (PRS) এবং Millenium Development Goals (MDG) এর আলোকে জাতীয় জনসংখ্যা নীতির খসড়া প্রণীত হয়েছে। এছাড়া, ইতোমধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিও প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচকসমূহের প্রবণতা সারণি ১২.৫ -এ দেখানো হল।

সারণি ১২.৫ঃ স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	১৯.৪	১৯.২	১৯.২	১৯.২	১৯.২	১৯.২
	শহর	১৬.৮	১৭.১	২০.১	২০.১	২০.১	২০.১
	গ্রাম	২০.৪	২০.১	১৭.১	১৭.১	১৭.১	১৭.১
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫.৮	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৫.৫
	শহর	৪.৭	৪.৯	৫.৯	৫.৯	৫.৯	৫.৯
	গ্রাম	৬.১	৫.৯	৪.৯	৪.৯	৪.৯	৪.৯
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৩.৮	২৩.৯	২৩.৯	২৩.৯	২৩.৯	২৪.৯
	নারী	১৮.৫	১৮.৭	১৮.৭	১৮.৭	১৮.৭	১৮.৬
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		২৮৩২	২৭৮৫	২৮৬০	২৮৬০	২৮৬০	২১২৯
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৬৭.২	৬৭.৭	৬৬.৮	৬৬.৮	৬৬.৮	৭০.৬৫
	শহর	৬৮.৭	৬৮.৯	৬৮.৩	৬৮.৩	৬৮.৩	
	গ্রাম	৬৬.৯	৬৭.৪	৬৬.২	৬৬.২	৬৬.২	
শিশু মৃত্যু হার (নবজাতক, <১ বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩৯	৩৬	৪৩	৪৩	৪৩	৪৩
	শহর	৩৭	৩৫	৪২	৪২	৪২	৪২
	গ্রাম	৪০	৩৭	৪৩	৪৩	৪৩	৪৩
শিশূ মৃত্যু হার (৫ বছরের নিম্নে, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	-	-	৫৩	৫৩	৫৩	৫৩
	শহর	-	-	৫০	৫০	৫০	৫০
	গ্রাম	-	-	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫
মাতৃ মৃত্যু হার (%)	জাতীয়	২.৫৯	১.৯৪	১.৯৪	১.৯৪	১.৯৪	১.৯৪
	শহর	১.৭৯	১.৭৮				
	গ্রাম	২.৮৫	২.৩০				
গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার (%)		৫৬.১	৫৬.৭	৬১.২	৬১.২	৬১.২	৬২
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.১৫	২.১২	২.৩	২.৩	২.৩	২.৩

উৎসঃ Health Bulletin-2014,UESD-2013,UN survey-2013 BDHS Survey,2000,2004,2007,2011 স্বাপকম;SVRS,BBS;BMMS-2010স্বাপকম।

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (HPNSDP)

সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণসহ পরিবারকল্যাণ, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে আরো গতিশীল করা এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি (এইচপিএন) খাতের বিদ্যমান বাধাসমূহ দূর করে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১১-১৬ মেয়াদে ১৩,৫৭৩.১৬ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য ও ৪৩,৪২০.৩৮ কোটি টাকা সরকারের অনুদানসসহ সর্বমোট ৫৬,৯৯৩.৫৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত Health Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) শীর্ষক তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হ'ল-জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং

স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস; রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার হ্রাস এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা।

কমিউনিটি ক্লিনিক

'অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ' এর মাধ্যমে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে গ্রাম/ ওয়ার্ড পর্যায়ে 'কমিউনিটি ক্লিনিক' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৯৯-২০০১ মেয়াদে ১০,৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত হয় এবং প্রায় ৮,০০০ টি চালু হয়। কিন্তু ২০০২-০৮ মেয়াদে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবা দান কার্যক্রম বন্ধ থাকে। পরবর্তীতে কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরোজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে পাঁচ বৎসর মেয়াদী (২০০৯-১৪) 'Revitaliazation of Community Health Care Initiative in Bangladesh' (কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি পর্যায়ক্রমে চালু করা হয় এবং বর্তমানে ১২,৮১৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাদানকারী হিসেবে ১৩,৫০০ জন কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) এর মধ্যে ১৩,২৪০ জনের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। চালু কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৩৫,৫৬,১৭,২৪৪ জন। স্বাস্থ্য খাতকে ডিজিটাল করার পদক্ষেপ হিসেবে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে ল্যাপটপ ও ইন্টারনেট মডেম প্রদান করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের অন্যতম অবদান হচ্ছে প্রসূতি সেবা যে কারণে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার ব্যাপকভাবে কমেছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী-র মাধ্যমে ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষা, কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ও ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত অন্ধত্ব দূরীকরণ, কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ ও টীকাদান ইত্যাদি কর্মসূচি জোরদার করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন হলে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস পাবে, গড় আয়ু বৃদ্ধি পাবে, রোগ প্রাদুর্ভাব হ্রাস পাবে। বর্তমানে দেশে Dengue, Swine Flu & SARS রোগগুলো দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। Smear Positive ফুসফুসের যক্ষারোগ নির্ণয়ের হার প্রায় শতকরা ১০০ ভাগে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি এ রোগের সম্পূর্ণ আরোগ্যের হার ৯১ শতাংশে বৃদ্ধি করে তা বজায় রাখা হচ্ছে। ফাইলেরিয়া ও ম্যালেরিয়া রোগ ২০১৫ সালের মধ্যে নির্মূল করার পর্যায়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। Child Health Programme, School Health Programme, Adoloscent Health Programme, ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হচ্ছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

ইপিআই কর্মসূচির আওতায় শিশুদেরকে রোগমুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। টিকার মাধ্যমে যেসব রোগ প্রতিরোধ করা যায়, তা প্রতিরোধ করে দেশকে রোগমুক্ত করার লক্ষ্যে ইপিআই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম, যক্ষা ও হেপাটাইটিস-বি রোগ প্রতিরোধ করার জন্য টিকা প্রদান করা হচ্ছে। সম্প্রতি দেশব্যপী টীকাদান কর্মসূচি উদযাপিত হয়েছে যার আওতায় প্রায় ৫ কোটি ২০ লাখ শিশুকে (৬ মাস থেকে ১৫ বছরের নিচে) হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করা হয়। এছাড়া, ২ কোটি ২০ লাখের অধিক শিশুকে 'ভিটামিন-এ' খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে 'ভিটামিন-এ' প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বছরওয়ারি 'ইপিআই কভারেজ' এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির তথ্য সারণি ১২.৬ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১২.৬ঃ ইপিআই এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির হার

বছর	বিসিজি (%)	ওপিভি-১ (%)	ওপিভি-২ (%)	ওপিভি-৩ (%)	পেন্টা-১ (%)	পেন্টা-২ (%)	পেন্টা-৩ (%)	হাম (%)	সকল টিকা (%)
২০১১	৯৯	৯৯	৯৭.৭	৯৫.১	৯৯	৯৭.৬	৯০	৮৮.৫	৮২.৯
২০১২	৯৯	৯৯	৯৭.৭	৯৫.১	৯৯	৯৭.৬	৯০	৮৮.৫	৮২.৯
২০১৩	৯৫	৯৫	৯৪	৯২	৯১	৯৩	৯২	৮৬	৮১
২০১৪	৯৯.২	৯৫.১	৯৪	৯২	৯১	৯৩	৯৫.১	৮৮	৮১ (<১ বছরের শিশু) ৯২ (<২ বছরের শিশু)

উৎসঃ Bangladesh EPI CES ২০১১,২০১২, ২০১৩ , হেলথ বুলেটিন-২০১৩,১৪

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা

মা ও শিশু স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে জরুরী প্রসূতি সেবা চালু, সিএসবিএদের প্রশিক্ষণ, পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ, নিরাপদ এমআর সেবা, বেসরকারি খাতের প্রসারে উৎসাহ প্রদান, মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম প্রবর্তন, সার্ভিক্যাল এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার এর আগাম সনাক্তকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী চিকিৎসক, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ও অন্যান্য মাঠ কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলায় Emergency Obstretic Care Unit (EOC) চালু করা হয়েছে। বর্তমানে চালু ও ব্যবহৃত EOC এর সংখ্যা মোট ৬৩০টি। EOC সেবা সম্প্রসারণের ফলে মাতৃমৃত্যুর হার মোট প্রসবের ০.৪ শতাংশে এবং নবজাতক মৃত্যু হার মোট জীবিত জন্মের ১.১ শতাংশে নেমে এসেছে। নারী স্বাস্থ্য উন্নয়নে Obstretric Fistula সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্র অনুমোদিত হয়েছে এবং Bangladesh National Strategy for Maternal Health চূড়ান্ত করা হয়েছে। এছাড়া, National Menstruation Regulation Services Guideline অনুমোদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

পুষ্টি সেবা

সারাদেশে পুষ্টি সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত National Nutrition Services (NSS) শীর্ষক একটি অপারেশনাল প্লান ২০১১ থেকে ২০১৬ মেয়াদে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হ'ল ; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের সেবা প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহায়তায় অপুষ্টিজনিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মাঝে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় পুষ্টি সেবা প্রদান; দৈহিক পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভাস পরিবর্তন ও পুষ্টিসমৃদ্ধ জীবনপ্রণালী প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা গড়ে তোলা এবং অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার কমানো। তৃণমূল পর্যায়ে শিশু অ-পুষ্টি রোধ করার জন্য ১৩০ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে Integrated Management of Childhood Illness Programme (IMCI) এর সাথে সমন্বিতভাবে পুষ্টি কর্ণার চালু করা হয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও এনজিও সমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করে NNS শহরের বস্তি এবং গ্রামের দূর্গম এলাকাসহ সারাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে জাতীয় পুষ্টি নীতি ও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নীতির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতির একটি সামগ্রিক চিত্র সারণি ১২.৭ -এ দেখানো হল।

সারণি ১২.৭ঃ বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতি

সূচক	২০০৭	২০১১	২০১৪
কম ওজনের শিশু (%)	৪১	৩৬	৩৫
খর্বাকৃতি শিশু(%)	৪৩	৪১	৩৯
শিশুর মাতৃদুগ্ধ পানের হার(%)	৪৩	৬৪	৬৪
শিশুকে মাতৃদুগ্ধ প্রদান কারী মায়ের আয়রন টেবলেট ও ভিট-এ প্রাপ্তির হার (%)	৯৮	১০০	১০০

সূত্রঃ UESD-2013, হেলথ বুলেটিন- ২০১৪

স্বাস্থ্য বীমা

স্বাস্থ্য খাতে বিকল্প অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি, সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষতা অর্জন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি - ২০১১ ও স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩২ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (Universal health coverage- UHC) অর্জনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কৌশল (২০১২-৩২) প্রণয়ন করা হয়েছে। UHC অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে টাংগাইল জেলার তিনটি উপজেলায় 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি' নামে একটি পাইলট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে, দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত জনগোষ্ঠিকে একটি ''স্বাস্থ্য কার্ড'' প্রদান করা হবে যার মাধ্যমে তারা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহ থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা পাবে। তাছাড়া স্বাস্থ্য বীমা বাস্তবায়নের সহায়ক আইন হিসেবে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন' এর খসড়া প্রণয়ন করেছে।

স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং ই-হেলথ কর্মসূচি

মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সফলতা আর্ন্তজাতিক অঙ্গাণে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এম আই এস) বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে সর্বস্তরে ই-হেলথ চালু করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় ৮০০ টি সরকারি হাসপাতালে SMS এর মাধ্যমে গ্রাহক অভিযোগ প্রদান বা স্বাস্থ্য সেবা পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। ৪৩ টি হাসপাতাল থেকে উন্নত টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হচ্ছে (Health Bulletin-২০১৪)। স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে নাগরিকদের অনলাইনে অভিযোগ/মতামত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, দেশের সকল স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির আওতায় আনার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্ট্রি উন্নত করে নাগরিকদের স্থায়ী স্বাস্থ্য বিবরণী তৈরী করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর আওতায় প্রতিটি নাগরিককে একটি অভিন্ন 'Health Identifier Code' প্রদান করা হবে যা জাতীয় পরিচয়পত্র ডাটা বেজ এর সাথে সংযুক্ত হবে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৪ এবং ৫ অর্জন করার জন্য প্রতিটি গর্ভবতী মা এবং ৫ বছরের নিচে শিশুদের তথ্য তালিকাভুক্ত করার কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। জেলা হাসপাতালসমূহকে পর্যায়ক্রমে স্বয়ংক্রিয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উপযোগী করে তোলা হচ্ছে। জাতীয় ই-হেলথ পলিসি এবং স্ট্র্যাটেজীর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে ই-হেলথ ব্যবস্থাপণায় বাংলাদেশের অমিত সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে যথাযথ নিরাপত্তা সহ তথ্য সংরক্ষণ ক্ষমতার উন্নয়ন এবং একটি জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যে কোনও দূর্যোগ মোকাবেলায় একটি ব্যাক-আপ সেন্টার ও স্থাপন করা হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি

১৯৬৫ সাল হতে সরকারি পর্যায়ে পরিবারকল্যাণ কার্যক্রম শুরু হবার ফলে বাংলাদেশের দুর্বল আর্থসামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষার হার কম হওয়া সত্ত্বেও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অদ্যাবধি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির

সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে আধুনিক ও কার্যকরী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ। জন্মপ্রতিরোধক সামগ্রী ব্যবহারের হার ১৯৭৫ সালে ৮ শতাংশ হতে ২০১৩ সালে ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৬ সালের পূর্বে প্রতিস্থাপনযোগ্য জন উর্বরতা নিশ্চিত করা সরকারের মূল লক্ষ্য এবং এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমানের মোট প্রজনন হার ২.৩ থেকে ২০১৬ সাল নাগাদ ২ এ নামিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে, যার অন্যতম হল পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার ৬১ শতাংশ থেকে ২০১৬ নাগাদ ৭৪ শতাংশ এ উন্নীত করা। বর্তমানে এমসিএইচটিআই আজিমপুর ও এম এফ টি সি মোহাম্মদপুর এবং ৭০ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে EOC সেবা প্রদান করা হচ্ছে। অদ্যাবধি ৩২৩ জন চিকিৎসককে এক বছর মেয়াদী এবং ৫৭৬ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকাকে ৬ মাসব্যাপী ইওসি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত ১,৫৯৪ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকাদের ধাত্রী বিদ্যায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৬ মাসব্যপী এবং ৮৩৯ জনকে ১৮ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার জন্য ৮,৪৩৯ সিএসবি-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শহরের বস্তি এলাকা, চরাঞ্চল, দুর্গম এলাকা, অনগ্রসর পল্লী অঞ্চল ও হাওড় এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য এলাকাভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উপজেলা, জেলা হাসপাতাল ও মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রসমুহের ৩,০০০ জন প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফারী নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ এবং রিপোর্টিং ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে ক্রয়/সংগ্রহ ও সরবরাহ অবস্থা ট্র্যাকিং করার জন্য Supply Chain Information Portal নামে একটি ওয়েব ভিত্তিক সফটওয়ার স্থাপন করা হয়েছে।

বেসরকারি স্বাস্থ্যখাত

বর্তমানে দেশে বেসরকারি খাতে ৮,৩৬৭ টি নিবন্ধিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে। এর মধ্যে ৫,৩৮৪ টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং ২৯৮৩ টি হাসপাতাল। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় এইচআইভি/এইডস ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ কিছু এনজিও সম্পৃক্ত রয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে, পিপিপি-র আওতায় দেশের দুটি সরকারি হাসপাতালে (চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিস এন্ড ইউরোলজি) কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার এর কার্যক্রম আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের কাজ চলছে। উন্নতমানের কতিপয় হাসপাতাল মহানগরে বিশেষ করে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু তাদের সেবার দাম গগনচুম্বী। তাদের স্বল্প ব্যয়ে বা বিনা ব্যয়ে গরীবের চিকিৎসা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট কোটা রাখার ব্যবস্থা প্রবর্তন সরকার একটি লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা

চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে এবং চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের কারিকুলাম হালনাগাদ ও গণমুখী করা হয়েছে। দেশে সরকারি পর্যায়ে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ছাত্রছাত্রীর ভর্তির আসনসংখ্যা ৪,৩০৮-এ উন্নীত করা হয়েছে। দেশে সরকারি পর্যায়ে মোট ২৯টি মেডিকেল কলেজ (৩,৭৭৬ আসন), ১ টি ডেন্টাল কলেজ (৫৩২ আসন), ২৩ টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইন্সটিটিউশন (২,০৯১ আসন), ৮ টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট প্রশিক্ষণ স্কুল, ৮ টি ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজি , ৪৪ টি নার্সিং ইন্সটিটিউট এবং ১৩ টি নার্সিং কলেজ দক্ষ জনশক্তি তৈরীর কাজ করছে। একই সাথে বেসরকারি খাতে মোট ৬৬টি মেডিকেল কলেজ (৪,৮৫০ আসন), ১৩ ডেন্টাল কলেজ, ১০ টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইন্সটিটিউশন, ১০৩ টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট প্রশিক্ষণ স্কুল, ৮৩টি ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজি, ৫২টি নার্সিং ইন্সটিটিউট এবং ১৮ টি নার্সিং কলেজ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও বিকল্প ধারার চিকিৎসা ব্যবস্থা উৎসাহিত করতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ১৫ টি অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার কলেজ (৪৫০ আসন) কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

নার্সিং সেবা

দেশে বর্তমানে ৩৫,৬০৮ জন রেজিস্টার্ড নার্স আছে, তার মধ্যে ১৮,২৯২ জন নার্স সরকারি চাকুরীতে, ১,১০০ জন বিদেশে এবং ১৪,০০০ জন দেশের বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত আছে। দেশে সরকারি নার্সিং ইন্সটিটিউটের আসন সংখ্যা ১৫৯০ থেকে বৃদ্ধি করে ২৫৮০ করা হয়েছে এবং ৩১ প্রতিষ্ঠানে (১০ টি নার্সিং কলেজ এবং ২১টি নার্সিং ইন্সটিটিউট) ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারী কোর্স চালু করা হয়েছে। দেশে অভিজ্ঞ নার্সের ঘাটতি পূরণের জন্য লালমনিরহাট, গাজীপুর, বান্দরবন জেলায় বেসিক বিএসসি নার্সিং কলেজের নির্মাণ কাজ চলছে এবং শেরেবাংলা নগর ও খিলগাঁও এ এমএসসি নার্সিং কলেজের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত প্রায়। এছাড়া, ১৪৬ জন নার্স বিশেষায়িত কোর্সে থাইল্যান্ড ও কোরিয়া থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, ৬৭ জন নার্স থাইল্যান্ড থেকে এমএসসি ও একজন পিএইচডি অর্জন করেছে। বর্তমানে ১৩ জন নার্স থাইল্যান্ডে এমএসসি এবং ১৪ জন নার্স পিএইচডি অধ্যয়নের জন্য থাইল্যান্ড ও কোরিয়ায় রয়েছেন। ২০১৬ সাল নাগাদ দেশে রেজিস্টার্ড নার্সের সংখ্যা ৪০,০০০ এ উন্নীত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে বেসরকারি উদ্যোগে নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের যে অসুবিধা ছিল তা দূর করে প্রাইভেট নার্সিং ইনস্টিটিউট বা কলেজকে সুযোগ দেয়া হচ্ছে।

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার

স্বাস্থ্য খাতকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করার জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের আওতায় বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমনঃ

- সেক্টরওয়াইড প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য খাতকে শক্তিশালী করা হচ্ছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রকে ইন্টারনেটের আওতায় এনে ই-হেলথ সেবা চালু করা হচ্ছে।
- ক্রমান্বয়ে সকল জেলা ও বিশেষায়িত হাসপাতালে ICU/CCU সেবা চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এর লক্ষ্যে ১৪ টি উপজেলায় 'লোকাল লেভেল প্ল্যানিং' এর পাইলট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- স্বাস্থ্য খাতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ এর মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ কে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহের নেতৃত্বে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
- দুর্গম এলাকাসমূহ নির্দিষ্ট করে প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার লক্ষ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জোরদার,পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা (Unmet Need) পূরণসহ এলাকা ও লক্ষ্যভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে।
- ২০৩৫ সালের মধ্যে প্রতিরোধযোগ্য শিশুমৃত্যু বন্ধ করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাস ও নীতিসমূহের সংস্কার সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিভিন্ন এনজিওদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নগরে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ ও জোরদার করা হচ্ছে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম

জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধানতম পূর্বশর্ত হচ্ছে নারী ও শিশুর উন্নয়ন। বিশ্বায়নের এ যুগে প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২ টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার আওতায় এ দেশের নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কাজ এগিয়ে চলছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তিনটি সংস্থা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর দেশের ৬৪ টি জেলা ও ৪১২ টি উপজেলায় এবং জাতীয় মহিলা সংস্থা ৬৪ টি জেলা ও ৮৪ টি উপজেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১। এর আওতায় এদেশের নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কাজ এগিয়ে চলছে।

শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও শিশু কল্যাণে শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ, পুষ্টি, শিক্ষা ও বিনোদনের কোন বিকল্প নেই । তাই শিশু-কিশোর কল্যাণে জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশু অধিকার সংরক্ষণ, শিশুর জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনাসহ শিশু নির্যাতন বন্ধ, বিশেষ করে কন্যাশিশুদের বৈষম্য বিলোপ সাধনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিশু একাডেমী ৬৪ টি জেলায় মহিলা ও শিশু উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি, ২০১৩। এছাড়া, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে প্রণয়ন করা হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০। প্রণীত হয়েছে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম উইং-এর তত্ত্বাবধানে চাইল্ড লেবার ইউনিট (CLU) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সকল নীতি ও কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে শিশুশ্রম ইউনিট অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করছে। এ ছাড়াও দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মতো উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে শিশুশ্রম নিরসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে CLU উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া, শিশুশ্রম নিরসনকল্পে "জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০" প্রণয়ন করা হয়েছে। ঝুকিঁপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের বিরত রাখার জন্য শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে যার মাধ্যমে আগামী তিন বছরে ৪০ হাজার শিশুকে ঝুকিঁপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে এনে তাদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হবে যাতে তারা পিতামাতাকে তাদের কাজে সহায়তা করতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে এবারের বাজেটে একটি শিশু বাজেট প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সমাজকল্যাণ

দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের ওপর দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করে। বর্তমান সরকার এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী, এতিম, দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দারিদ্রবিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সংশোধন, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন, দুঃস্থ

ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের লালনপালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসন, পরিত্যক্ত নবজাতক শিশুদের লালন-পালন, ভবঘুরে পুনর্বাসন, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, নিরাপদ আবাসনসহ বহুবিধ কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালনা করছে।

কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা/চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম, সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়, ব্রেইল প্রেস, প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র, মিনারেল ওয়াটার প্লান্ট ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র অন্যতম। গরীব ও অসহায় রোগীদের সেবা দানের জন্য হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ৪,০৪,০৫৩ জন গরীব রোগীকে ৯১টি ইউনিটের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা, মনস্তাত্ত্বিক ও চিকিৎসা সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের নিজস্ব পরিবেশে এবং স্থানীয় শিক্ষালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমন্বিত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৪ টি জেলা শহরে সমন্বিত অন্ধশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ যাবত উপকারভোগীর সংখ্যা ১,১৬২ জন। প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র মৈত্রী শিল্পসহ দেশের সর্বপ্রথম মিনারেল/ ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। ব্রেইল প্রেসে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র সংশোধনপূর্বক সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শিশু আইন, ২০১৩ এর ভিত্তিতে এ যাবত ৩টি কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা ২০,৪৮৯জন। সমাজসেবা অধিদপ্তর ভবঘুরেদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৬টি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এ ৬টি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রের আসন সংখ্যা ১,৯০০ জন। শিশু-কিশোরী মহিলাদের কারাগারের পরিবেশ হতে ভিন্ন পরিবেশে রাখার জন্য দেশে ৬টি মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত আশ্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা ১৪৯ জন। এছাড়া, সেফ হোম এর মাধ্যমে শুরু হতে এ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা ৭,৭৪০ জন। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রায় ১১ হাজার কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

দেশে বর্তমানে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে ১০,৩০০ জন এতিম শিশুর ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত নিবন্ধিত এতিমখানায় প্রতিপালিত শিশুদের মধ্যে মাসিক মাথাপিছু ১,০০০ টাকা হারে ৭৪.৪০ কোটি টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৬১,৯০০ জন এতিম শিশু উপকৃত হচ্ছে। এছাড়া, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর অধীনে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, অটিজম রিসোর্স সেন্টার, অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল, প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণসহ প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

যুব ও ক্রীড়া

যুব উন্নয়ন

যুবসমাজের মেধা, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও কর্মস্পৃহাকে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে যুবসম্প্রদায়কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রেক্ষাপটে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৮১ সাল থেকে বিভিন্ন ট্রেডে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ৪৪,৩৫,৪৮২ জন যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলাদের মধ্য থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ২০,০৬,৩৬২ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,০২,৭৭২ জন এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ১,৯৮,০২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৩২,০৫২ জন আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে।

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে "ন্যাশনাল সার্ভিস" কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। "ন্যাশনাল সার্ভিস" কর্মসূচির অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক/যুব-মহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলাকে কর্মসূচির পাইলট এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রংপুর বিভাগের অবশিষ্ট ৭টি জেলার মোট ৮টি উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশের ১৭টি জেলার ১৭টি দরিদ্রতম উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৭১,৩১৬ জন যুবক/যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে মোট ৭০,৫২১ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১২২ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণ করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার বেসিক কোর্স ও গ্রাফিক ডিজাইন ও ভিডিও সম্পাদনা কোর্সে এ পর্যন্ত মোট ১,২৯,৫১৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ভ্যানের মাধ্যমে ৮৮৮ জনকে ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশিবির, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় যুব কেন্দ্র মূলতঃ একটি মানব সম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ১৪,৫২১ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে বগুড়ায় আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ৬,১২৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

ক্রীড়া উন্নয়ন

একটি জাতির ক্রীড়ার মান উন্নয়নে অপরিহার্য উপাদান হলো পর্যাপ্ত ক্রীড়া অবকাঠামো সুবিধাদি এবং সঠিক প্রশিক্ষণ। সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও বর্তমান সরকার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলার আয়োজন ও সংগঠনের বিষয়ে যুব নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২,৬২,৫৮০ জন ছেলেমেয়েকে ক্রীড়া কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, ক্রীড়া প্রতিভা সনাক্তকরণ, প্রতিভাবান খেলোয়ারদের পরিচর্যা ও যোগ্য প্রশিক্ষক এবং ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং এর মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ সকুমার শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে আসছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও উৎসাহ প্রদানের কাজ করছে। বাংলা একাডেমী, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র শিক্ষা, গবেষণা,পুস্তক, জার্নাল প্রকাশসহ সকল শ্রেণীর পাঠকের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান (তিন খন্ড), খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের ২০টি জীবনী গ্রন্থমালা প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া, ৫টি গবেষণামূলক গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে এবং ৪০টি ফোকলোর সংগ্রহশালার সিরিজ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করছে। আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর শিক্ষা, গবেষণা কাজে পুস্তক, জার্নাল নথিপত্র সংরক্ষন ও প্রকাশ করছে। কপিরাইট অফিস দেশ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৃজনশীল

ব্যক্তিবর্গের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাইরেসি রোধ করছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর দেশের পুরাকীর্তি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন লোকজ ও কারুশিল্প উন্নয়নের জন্য নানবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাতটি কেন্দ্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্য বিকাশ ও সংরক্ষণের কাজ চলছে। বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন সাইট-সমূহে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে।

পাঠসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য দেশের উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে গণগ্রন্থাগার স্থাপন এবং নির্বাচিত পুস্তকসমূহ ই-বুকে রুপান্তর করা হচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের উন্নয়নের জন্য গ্যালারীসমূহের আধুনিকায়ন ও সংস্কার, বিক্রয়কেন্দ্র আধুনিকীকরণ, আহসান মঞ্জিলের আবশ্যকীয় কাজ সমাপ্ত করা হচ্ছে। শ্রীলংকার কান্ডিতে অবস্থিত দালাদা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ যাদুঘরে বাংলাদেশ কর্ণার সজ্জিত করা হচ্ছে। জাতীয় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। কপিরাইট ও কপিরাইট আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান

শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে স্বল্প, মধ্যম ও দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, শিল্প ও কারখানাসমূহে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা, বিভিন্ন শিল্প এলাকায় শ্রম-কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা, শ্রম সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ বাস্তবায়ন, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত এবং শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিনিয়ত কাজ করে আসছে। এছাড়া, শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব সমাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় শ্রমনীতি পূনঃমূল্যায়ন ও সংশোধন, ন্যূনতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ, শিশু শ্রম নিরসন বিষয়েও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে দেশে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) গঠণ করা হয়েছে। পরিষদ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও সমন্বয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।